

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

# বাঙালি সংস্কৃতিতে নারী

এই লেখার নাম 'প্রফুল্ল কেন বাসন মাজে' দিলেও অন্যায় হতো না। বাঙালির সংস্কৃতিতে প্রফুল্লরা দীর্ঘকাল ধরে বাসন মাজছে— কেউ স্বেচ্ছায় কেউবা বাধ্য হয়ে। স্বেচ্ছায় যে করে তার কাজটা আরও মর্মান্তিক। কেননা সে জানে না সে কি করছে, মনে করছে মহৎ কাজে নিয়োজিত আছে, জীবন চরিতার্থ হচ্ছে। আসলে যা ঘটছে সে তো দাসত্ব, তাও আবার মজুরিবিহীন। এই সমস্তটাই অবশ্য সম্ভব হচ্ছে একটা আদর্শবাদের অনুশাসনে। প্রফুল্লের ক্ষেত্রে এটাই ঘটছে।



প্রবন্ধ

উপন্যাসে মেয়েরা অসামান্য। নানাবিধ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করে প্রফুল্ল সব নায়িকাকে ছাড়িয়ে যায়। দশ বছরের সাধনায় প্রফুল্ল দেবী চৌধুরাণী হয়েছে ভবানী পাঠকের নির্গিমেষ তত্ত্বাবধানে। সে ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন, গীতা সব পড়েছে, মল্লযুদ্ধও শিখেছে। বাংলার রবিনহুড যেন, দুষ্টির দমন ও শিষ্টির পালন করে সে অরণ্যের অভ্যন্তরে।

কিন্তু পরিণতিটা কি? দেখা গেল অপদার্থ যে স্বামী প্রফুল্লের পা টিপবারও উপযুক্ত নয়, শেষ পর্যন্ত তারই ঘরে বধুবেশে ফেরত যাচ্ছে। তিন পত্নীর এক পত্নী হয়ে। রান্নাবান্না, ঘরসংসার সব তো করছেই, পুকুরঘাটে বসে বাসনও মাজছে ওই প্রফুল্ল, অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে। বোঝা যায় বঙ্কিম নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছিলেন। কি করেন, কোথায় নিয়ে যান। দেবী চৌধুরাণী যখন লিখছেন তখন তিনি রক্ষণশীল হয়ে উঠেছেন, ঝুঁকে পড়েছেন ধর্মের দিকে। বিদ্রোহিনীদের নিয়ে অস্বস্তি অবশ্য আগেও ছিল। নইলে বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনীকে আত্মহত্যা উদ্বুদ্ধ করবেন কেন? কুন্দনন্দিনীর বিদ্রোহটা ছিল শান্ত, সে আত্মহত্যা সম্মত হয়েছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণী উগ্র, সে অত সহজে বিদায় নেয়নি, তার জন্য গোবিন্দলালের হাতে পিস্তল তুলে দিতে হয়েছে, যাতে সে গুলি করে রোহিণীকে হত্যা করতে পারে।

প্রফুল্লকে নিয়ে সমস্যাটা এই যে, সে বিষ খাবে এমন পাত্রী নয়, তাকে গুলি করে মারবে এমন পাত্রও কোথাও নেই, কোম্পানির সাহেবদের মধ্যও নেই। প্রফুল্লকে তাই ফেরত আনতে হলো ব্রজেশ্বরের গৃহে, সেখান থেকে পুকুরঘাট আর কতদূর।

বলা অসঙ্গত নয় যে, এটাও এক ধরনের হত্যাকাণ্ডই। গুলি করে নয় বটে, তবে বিষ খাইয়ে ঠিকই। প্রফুল্ল জানে না যে সে বিষ খেয়েছে। আদর্শবাদের বিষ। সংসারে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে এই আদর্শবাদ বলে যে, নারীজন্মের চরম চরিতার্থতা রয়েছে সন্তান উৎপাদনে, পুরুষের লালসা চরিতার্থ করণে এবং ঘরসংসারের নিত্যকার কর্তব্য সম্পাদনে। প্রফুল্ল সংসারী হয়েও সন্ন্যাসিনী।

ঔপন্যাসিক বলেছেন এ কথা, তার ক্ষেত্রে তাই ঘরকন্য়ার কাজটিই



সবচেয়ে জরুরি। বাসন তো মাজতেই হবে। প্রফুল্ল সন্ন্যাসিনী না হলে তার ওপর আরও একটি দায়িত্ব বর্তাত, সেটি হচ্ছে সন্তান উৎপাদন এবং ওইখানে ব্যর্থ হলে যতই সে দেবী হোক কিংবা রানী, বন্ধ্যা বলে অসম্মানিত হতো, অনুর্বর শস্যখেতের মতো।

২. নারীর পরাজয় অবশ্য বিশ্বে ঐতিহাসিকভাবেই ঘটেছে। এটা সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে ঘটেছে যখন নারী আপন সন্তানকে মাতার পরিচয়ে পরিচিত করার অধিকার হারাল। ব্যাপারটাকে এ্যাঙ্গেলস খুব পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে সন্তানের পরিচয় মাতার নামে নয়— পিতার নামে হবে, এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় থেকেই পুরুষ গৃহের লাগাম পেয়ে গেল তার হাতে, আর নারী অবনমিত, সম্মোহিত হলো, পরিণত হলো পুরুষের লালসা মেটানোর ও সন্তান



প্রজন্মের যন্ত্রে।

এর সঙ্গে নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক বিভাজনও জড়িত। সন্তান প্রজন্মের ব্যাপারে পুরুষ ও নারীর কাজের যে পার্থক্য, সেটাই হচ্ছে আদি শ্রম-বিভাজন। আর এক পত্নী-এক স্বামী বিবাহব্যবস্থায় পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, সেইখান থেকেই শ্রেণি দ্বন্দ্বের শুরু। বিভাজন বৈষম্য সৃষ্টি করেছে এবং বৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় নিয়ম এটাই যে, একপক্ষ যদি এগিয়ে তবে অন্যপক্ষ পিছাবে। যেজন্য পুরুষ এগিয়েছে, নারী গেছে পিছিয়ে।

শ্রেণি অবশ্যই সত্য। ধনী নারী গরিব পুরুষের তুলনায় যে অধিক ক্ষমতাবান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু একই শ্রেণির ভেতর অবস্থানকারী একটি মেয়ে পুরুষের তুলনায় নানা কারণে পিছিয়ে পড়ে; একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে প্রফুল্ল যার শিকার হয়েছে, সেই আদর্শবাদ। তাছাড়া এটাও তো সত্য যে, ব্যক্তির শ্রেণি ও বর্ণ পরিচয় তবু মিটিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু নারী-পুরুষের জৈবিক ব্যবধানটা থেকেই যায়, যে বিভাজনের সুযোগ নিয়ে বৈষম্য আরও বাড়ে।

পুরুষ অধিপতি, নারী তাই নির্যাতিত। যখন আদর পায় তখনও অধীনেই থাকে এবং অর্জনের মাপকাঠি পুরুষই ঠিক করে দেয়। নারীর বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরাজয়ের পর তার পক্ষে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হয়েছে; সভ্যতা অগ্রসর হয়েছে কিন্তু নারী-পুরুষের বৈষম্য ঘোচেনি, অনেক সমাজে বৃদ্ধি পেয়েছে। অগ্রসর ইউরোপে ফরাসি বিপ্লব মানবমুক্তির ইতিহাসে এক মাইলফলক, কিন্তু বিপ্লবের পরে ১৭৯৩ তে যে শাসনতান্ত্রিক সম্মেলনে মানুষের সর্বজনীন অধিকার স্বীকৃতি পেল তাতে মেয়েদের ব্যাপারে কিছুই বলা হলো না। ১৮৬৭তে ইউরোপের কোথাও কোথাও (এবং আমেরিকায়) সর্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু সেটা শুধু পুরুষদের জন্যই, মেয়েরা তখনও ওই অধিকার পায়নি। ১৮৭১-এর প্যারিস কমিউনেই প্রথম দেখি নারী ও পুরুষ সমান গুরুত্ব পাচ্ছে। ইংল্যান্ডে মেয়েরা ভোটাধিকার পায় ১৯১৮তে, তাও সীমিত সংখ্যায়। ১৯২৮ সালে পৌছে তবেই সেখানে ২১ বছর ও তার ওপরের মেয়েরা ভোটাধিকার পেল। ভারতে এই অধিকার মেয়েরা পেয়েছে ১৯৫০তে, বাংলাদেশে আরও বিশ বছর পরে, ১৯৭০ তে।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশের সুনাম ছিল, প্রাচুর্যের দেশ বলে অতিসুখ্যাত মিসরের তুলনাতো উর্বর ছিল এর ভূমি—এমন মন্তব্য শোনা গেছে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষই ছিল দরিদ্র এবং ওই দরিদ্রদের মধ্যে মেয়েরা ছিল দরিদ্রতর। উল্লেখ আছে যে, ভারতবর্ষে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যেসব পিতামাতা দারিদ্র্যের দরফত যোগ্য বর খুঁজে পেত না কন্যাসন্তানদের তারা বাজারে এনে বিক্রি করে দিত, নিষ্কৃতির আশায়। ভারত সম্পর্কে যা সত্য বাংলা সম্পর্কে তা মিথ্যা হওয়ার কথা নয়। দশম শতাব্দীতে রচিত আদি বাংলা কাব্য 'চর্যাপদে' মেয়েদের দেখি নানা রকমের কাজ করছে। তারা নৌকা বায়, মদ চোলানোতে হাত লাগায়, হাতি পোষে, শিকারও করে; ডোম ও চন্ডালের কাজ তো রয়েছেই। তারা আক্ষেপ করে যে হাঁড়িতে ভাত নেই। কিন্তু এই মেয়েরা নিরাপত্তা পায় না। ব্রাহ্মণ তার শত্রু, চন্ডালও তাই। ভুসুকু বলছে সে বাঙালি হয়েছে, অর্থাৎ তার অধঃপতন ঘটেছে, কেননা তার 'ঘরিণী'কে চন্ডালে নিয়ে গেছে। এটা দেখা যাচ্ছে যে, বাঙালি হওয়া আর মানুষ হওয়া যে এক নয় এ বক্তব্য বাঙালি আদি কবিরাও রেখে গেছেন। সংস্কৃত কাব্যশ্লোকের সঙ্কলন গ্রন্থ 'সমুদ্রিকর্ণামৃতে' সেন আমলের সমাজচিত্র পাওয়া যাবে। পুরুষ আক্ষেপ করছে, বলছে শিশুরা ক্ষুধায় কাতর, তাদের দেহ শবের মতো শীর্ণ, প্রীতি নেই, বান্ধব নেই, জলপাত্রে জল নেই। এসব তবু সহ্য হয়, কিন্তু সেই কষ্টের কোনো তুলনা নেই যখন দেখি গৃহিণী তার ছেঁড়া কাপড় সেলাই করার জন্য করুণ হাসি হেসে কুপিত প্রতিবেশীর কাছে যায় সুই ধার করতে। এ হচ্ছে পুরুষের অক্ষমতা, কিন্তু নারীর দুর্দশাটা কেমন ছিল সেটা ভাবার বিষয়, যদি ভাবতে চান। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায় এসেছিলেন পর্যটক ইবনে বতুতা, এসে প্রাচুর্য দেখেছেন। কিন্তু দাস-ব্যবসা না দেখে পারেননি। দেখলেন খুব সস্তায়, মাত্র ১ দিনারে, মেয়েরা বিক্রি হচ্ছে। অনিন্দ্যসুন্দর একটি মেয়েকে তিনি কিনে নিয়েছিলেন, ওই দামে। তিনি পর্যটক তাই কিনলেন, হানাদার কিংবা ব্যবসায়ী হলে ছিনতাই করতেন। পর্তুগিজ হামাদ বর্মি মগ, মহারাষ্ট্রীয় বর্গিরা যে হানা দিত সে তো ঐতিহাসিক সত্য এবং তাদের লোলুপতার প্রথম শিকার হতো মেয়েরাই। যেমন হয়েছে তারা একান্তরে। বাংলায় বারবার দুর্ভিক্ষ হয়েছে, এর প্রতিটি দুর্ভিক্ষেই সবচেয়ে কঠিন দুর্ভোগ

মেয়েদেরকেই পোহাতে হয়েছে। ছিয়াত্তরের মন্সুরের বর্ণনা দিতে গিয়ে 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন— 'লোকে গরু বেচিল, লাঙল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল। জোতজমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষেও মেয়ে বিক্রি হয়েছে এবং বহুক্ষেত্রে স্বামী পালিয়ে গেছে স্ত্রীকে ফেলে রেখে। ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষেও ওই রকম ঘটনার খবর পাওয়া গেছে।

স্ত্রীকে বিক্রি করে দেয়ার ইতিহাস অবশ্য অতিপুরাতন। 'মহাভারতে'র যুধিষ্ঠিরও তো ওই কাজই করেছিলেন, পাশা খেলায় বাজি রেখেছিলেন দ্রৌপদীকে, যে-দ্রৌপদী তার একার নন, অন্য চার ভাইয়েরও স্ত্রী বটে। কোম্পানি আমলে উইলিয়াম জোনস কলকাতায় এসেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বের ঘটনা। তার আদালতে বিচারের জন্য একটি হত্যা মামলা এসেছিল, যাতে অভিযোগ এই যে, একজন ইউরোপীয় তার এক দাসীকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। ওই মামলার রায় দেবার সময় জোনস দাসব্যবস্থার বিস্তার নিন্দা করেছিলেন। সেই সময়ের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার অধীনে মেয়েদের অবস্থাটা কেমন তা ধারণা করা যায় আরেকটি দৃষ্টান্ত থেকে। উদারপন্থী আরেক ইংরেজ এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। এক ইংরেজ অফিসার একটি হিন্দু মেয়ের ওপর অত্যাচার করেছিল; জানতে পেরে মেয়েটির স্বামীর দিককার লোকজন ভেবেছে এই মেয়েকে দিয়ে আর কি হবে, একে হত্যা করাই মঙ্গল। তারা সে কাজই করেছে। হত্যা করে তাকে ফেলে রেখে এসেছে সাহেবের তাঁবুর দরজায়। ব্যাপারটা আদালতে উঠেছিল। ঘটনা যে সত্য তা সবাই জানত। আদালতে বিচার করে শাস্তিও দিয়েছে। শাস্তি পেয়েছে তারাই যারা মামলা দায়ের করেছিল; ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তারা যে সাহেবকে অপদস্থ করবার জন্য নিতান্ত বিদ্রোহপ্রসূত হয়েই এই মামলা নিয়ে আদালতে এসে হাজির হয়েছে— এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আদালত প্রত্যেককে এক হাজার টাকা জরিমানা ও সেই সঙ্গে তিন মাসের জেলের শাস্তি দিয়েছে।

শোনা যায়, কোম্পানি আমলে চার সদস্যের কোনো কোনো পরিবারে দাসদাসীর সংখ্যা ছিল ১১০ জন। আজকের বাংলাদেশে অবশ্য ওই অবস্থা নেই, উন্নতি হয়েছে; কিন্তু সম্পন্ন গৃহে ভিন্ন নামে দাসী নেই— এটা সত্য নয় এবং তাদের ওপর দৈহিক নিপীড়ন যে ঘটে না এটাও বলা যাবে না। ফরাসি দেশের মানুষ ফ্রান্সোয়া বার্নিয়ের; ভারত ভ্রমণে ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৮ এই বারো বছর কাটিয়েছেন, বাংলাতেও এসেছিলেন। অনেক কথা বলার সঙ্গে এ কথাও বলেছেন বার্নিয়ের যে, বাংলায় তখন পর্তুগিজ ও ডাচ বণিকেরা ছিল, তারা বলত যে বাংলায় ঢুকবার পথ রয়েছে একশটা। কিন্তু বেরবার পথ নেই একটিও। এর কারণ হলো প্রকৃতিতে প্রাচুর্য এবং মেয়েদের সৌন্দর্য ও উদারতা। মেয়েরা নিশ্চয়ই ইচ্ছা করে উদার হয়নি, তাদের উদার হতে বাধ্য করা হয়েছে। তাদের প্রতি আচরণে দস্যুতে ও বণিকে তফাৎ ছিল না।

বাঙালির আদি ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে নীহার রঞ্জন রায় লক্ষ্য করেছেন, পাল ও সেন আমলের লিপিশিষ্টে এই রকমের ধারণা দেয় যে, 'লক্ষ্মীর মতো কল্যাণী, বসুধারার মতো সর্বসহা, স্বামী ব্রতনিয়তা নারীই ছিল নারীর চিত্তাদর্শ।' কিন্তু কেন এই চিত্তাদর্শ? তার ব্যাখ্যা ওই বর্ণনাতেরই রয়েছে, 'স্বামীর ইচ্ছারপিনী হওয়াই তাহাদের বাসনা ছিল। অনুমান করা খুবই সঙ্গত যে, স্বামীর ইচ্ছার এই প্রবল চাপ, কেবল ব্যক্তি স্বামীর একার যে তা নয়, এ ছিল গোটা ব্যবস্থার। রূপগুণে লক্ষ্মী হতে হবে— এই আদর্শবাদের শক্ত অনুশাসন তারপরও যুগ যুগ ধরে কার্যকর ছিল, এখনও আছে। প্রফুল্লর সাধ্য কি পালিয়ে বাঁচে; পরিবার ও সমাজ থেকে সরে যেতে পারে, প্রফুল্ল গিয়েছিল বটে, কিন্তু আদর্শবাদ থেকে পালাবে কি করে, সে তো রয়ে গেছে সমগ্র চিন্তা ও চেতনাজুড়ে, শাসন করেছে তাকে ফ্যাসিবাদী কায়দায়।

নৃতাত্ত্বিকভাবে বাঙালি মিশ্র নরগোষ্ঠী। স্থানীয় আদিবাসীরা আগেই ছিল; অন্যরা বাইরে থেকে এসেছে। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আগন্তুক হচ্ছে আর্যরা। তাদের ধর্মমতের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য — হলো জন্মান্তরবাদ ও কর্মফল। এই ধর্মমত প্রচারের জন্য দায়ী হচ্ছে ব্রাহ্মণরা। যারা ছিল নেতা। আদি ব্রাহ্মণরা পূজারি ছিল না, দেব-দেবীদের তুষ্ট করবার জন্য তারা হোম ও যজ্ঞের ব্যবস্থা করত। পরে মূর্তিপূজা এসেছে এবং সেই পূজার অধিকার ব্রাহ্মণেরই রইল, তবে পুরুষ ব্রাহ্মণেরই শুধু, মেয়েদের নয়, ব্রাহ্মণ হলেও



নয়। উপবীত পুরুষই ধারণ করে, মেয়েরা করে না। মেয়েরা মেয়ে হয়েছে কর্মফলে, অর্থাৎ কর্মদোষে এবং জন্মসূত্রেই শূদ্রের জন্য জন্মান্তরের কোনো আশা নেই, ব্রাহ্মণ রমণীর জন্য আছে।

স্থানীয় মানুষদের আদিবাসী সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের একটি ছিল মাতৃতান্ত্রিকতা। তাদের সমাজে দেবতার তুলনায় দেবীই ছিল প্রধান। এমনকি তাদের হাতে পড়ে দেবতাও মেয়েলি হয়ে যেত, যেমনটি ঘটেছে কঠোর শিবের ক্ষেত্রে। ভারতের অন্যত্র শিব উগ্র, বর্তমানকালের শিবসেনাদের তিনি আদর্শ ও পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু বাংলায় এসে তিনি পরিণত হয়েছেন আপন ভোলা কৃষকে, ভাং-গাঁজা খান, অন্যমনস্ক থাকেন। বাঙালির পক্ষে মাতাকে আদর্শায়িত করার কারণ মনে হয় একটি নয়, দুটি। প্রথমটি অবশ্যই কৃষিনির্ভরতা। কৃষকের কাছে জমি হচ্ছে মায়ের মতো। বাঙালি কৃষি থেকে যত দূরেই সরে যাক, তার ভেতরে সর্বদাই একজন কৃষক বসবাস করে, যার জন্য প্রকৃতিরূপিণী মাতা, আশ্রয়দাত্রী মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তার একটি অন্তর্গত নির্ভরশীলতা রয়েছে। মাতার প্রতি আকর্ষণের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে পিতার শত্রুতা। পিতা বহিরাগত, সে এসেছে বিজয়ী বেশে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে, নিয়ন্ত্রণ করেছে সমাজকে এবং যখন শাসন করেনি তখনও দেখা গেছে ব্যর্থ হয়েছে আশ্রয় দিতে। দুস্থ বাঙালিকে তাই মানসিকভাবে মাতার কাছেই যেতে হয়েছে। বিপদের দিন সমষ্টিগতভাবেও গেছে সে মায়ের কাছেই, যেমন হিন্দু মধ্যবিত্ত গেছে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের সময়, মুসলমান মধ্যবিত্ত গেছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কালে। বাঙালি তার অভিমানের জন্য প্রসিদ্ধ। এমনকি অমন যে প্রবল বিদ্রোহী কাজী নজরুল ইসলাম তার লেখাতেও অভিমানী কিশোরের অনেক প্রকার চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখতে পাই। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অভিমান প্রকাশের জন্য মাতাই হচ্ছেন আদর্শ স্থান ও কাজ আমরা এখনও করি কিংবা করতে চাই। পলাশীর যুদ্ধের সময়কার কবি রামপ্রসাদ মায়ের বিরুদ্ধে অনেক বিষয়ে অভিযোগ করেছেন। অন্যের দুখে বাতাসা পড়ে, রামপ্রসাদের শাকে অন্ন মেলে না, অন্যরা ধনজন, হস্তী-অশ্ব-রথ সব পায় অথচ রামপ্রসাদ নিঃশ্ব এর কারণ কি এই যে তারা 'তোমার বাপের ঠাকুর', 'আমি কি তোমার কেউ নয়?' এসব প্রশ্নে উঠে এসেছে। এও বলেছেন কবি, 'আমি কি তোমার পাকা ধানে দিয়েছি মই?' এ রকম অন্তরঙ্গ জিজ্ঞাসাবাদ মাতার সঙ্গেই সম্ভবপর, পিতার সঙ্গে নয়। পিতা ধমক দেবেন, রক্তক্ষু দেখাবেন।

কিন্তু সামাজিক শাসনটা ছিল পিতৃতান্ত্রিক। রাষ্ট্রশাসন তো বটেই। আর্ঘ্য, তুর্কি, পাঠান, মুঘল, ইংরেজ, পার্শ্বাঞ্চল সিকল শাসকই মনে করেছে তারা পিতার কাজ করছে, প্রজাদের উপকারে নিয়োজিত রয়েছে। আর ওইসব কর্তৃত্বকারী, আধুনিক পরিভাষায় ফ্যাসিবাদী, শাসকদের চাপে বিপদগ্রস্ত হয়েছে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবন। এডমন্ড বার্ক তার উদারনৈতিকতার জন্য প্রশংসিত হয়েছেন; ভারতে কোম্পানির শাসকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি পার্লামেন্টে দক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, কিন্তু তিনিও মনে করতেন ইংরেজ হচ্ছে ভারতীয়দের পিতার মতো; তিনি ব্যথা পেয়েছেন এটা দেখে যে, ভারতে গিয়ে ইংরেজরা ওই ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আর পেনাল কোড ও ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তক মেকওলে তো বলেছেনই যে, ভারতের জন্য ইংরেজের শাসন হচ্ছে একটা আলোকিত ও পিতৃতান্ত্রিক স্বৈরাচার। স্বাধীন বাংলাদেশেও যারাই শাসনক্ষমতা পান, তারাই মনে করেন যে পিতার কর্তৃত্ব পেয়েছেন, ব্যক্তিগতভাবে যদি তিনি মহিলা হন তবুও। যে আমলাতন্ত্র রাষ্ট্র চালায় তারা মোটেই সেবক নয়, পিতা। ব্যবসায়ীদের আচরণও এখানে বিক্রোতার নয়, বরঞ্চ মালিকের। পিতাতে মানুষের আস্থা নেই, মাতাতে যে আছে, তাও নয়। এই ব্যাপারটা খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যখন পুত্রসন্তান লাভের জন্য ব্যাকুলতাটা প্রকাশ পায়।

এমনকি মাতৃভাষার প্রতিও যতই ভালোবাসা থাক শিক্ত লোকে রাষ্ট্রের ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত, ফার্সি ইংরেজির ব্যাপারেই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হয়েছে অনেক ত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, কিন্তু বাংলাদেশের আজ ইংরেজির দাম অবশ্যই বাংলার চেয়ে বেশি। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে যেমন দেখা যায় উচ্চবর্গের লোকেরা কথা বলে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে, নারী ও সাধারণ মানুষ বলে প্রাকৃত, যে প্রাকৃত হচ্ছে সাধারণের ভাষা; তেমনিভাবে আমাদের পূর্বের ইতিহাসে তো বটেই, বর্তমান ইতিহাসেও দেখা যাবে মাতৃভাষা থেকে ক্রমাগত দূরে সরে আসছে।

ওদিকে সমষ্টিগতভাবে যেমন ব্যক্তিগতভাবে আরও অধিক পরিমাণে ছেলেরা বিপদে পড়লে মায়ের কাছে ছোট্টে, আঁচল খোঁজে, ঠিক যেমনিভাবে বাইরে অসম্মানিত গৃহকর্তা ঘরে এসে সম্মান আদায় করতে চায়, প্রয়োজনে স্ত্রী ও কন্যাদের নিগূহীত করে। মাতা যে লড়াই করবে তা নয়— লড়াই করবে পিতাই, মাতা দেবে স্নেহ, দেবে সান্ত্বনা। খ্যাতিবানদের কথাই ধরা যাক। কেশবচন্দ্র সেন যখন প্রায় খ্রিষ্টাব্দ তখন ব্রহ্মকে পিতা বলতেন, যখন তিনি রামকৃষ্ণের ভক্ত হয়েছেন তখন থেকেই দেখা গেছে তার জন্য ব্রহ্ম মাতায় পরিণত হয়েছে। নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ আগে নাস্তিক ছিলেন, মদ্যপান ছাড়া সুস্থির হতে পারতেন না; পরে অসুস্থ হওয়ায় সব বদলে গেল, তিনি কালীভক্ত হলেন, মঞ্চ নামার আগে মাকে ডেকে তবে নামলেন।

আর মেয়েদের জন্য মা ছাড়া ভরসার কী! কে বুঝবে দুঃখ? রবীন্দ্রনাথের 'শান্তি' গল্পে চন্দ্রার ফাঁসির হুকুম হয়েছে। মিথ্যা অভিযোগে। প্রচলিত অভিমান চন্দ্রার, বিশেষ করে স্বামীর ওপর। চন্দ্রা বাঁচতে চায় না। ফাঁসির আগে শেষ ইচ্ছা কী জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। চন্দ্রা বলেছে সে তার মাকে দেখতে চায় শেষবারের মতো। মা অনুপস্থিত, স্বামী এসেছে জেলখানার দরজায়। স্বামীকে দেখতে চায় কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে চন্দ্রা বলে 'মরণ'। এবং মুখ ঢাকে।

৩.

নারী-পুরুষে বিভাজন ও বৈষম্য এবং বিভাজন-বৈষম্যকে আদর্শে পরিণত করার ব্যাপারটি হঠাৎ করে আসেনি, প্রোথিত রয়েছে একটি দীর্ঘ ঐতিহ্যে। লোকগানে আছে, 'মেয়েছলে মাটির ঢেলা/টপ করে নিয়ে জলে ফেলা।' এ হচ্ছে পুরুষের কথা, 'অপরের বিষয়ে।' অপর যদি ভয়ঙ্কর হয় তবে তাকে পূজা করতে আপত্তি নেই, তবে যদি দুর্বল হয় তবে কথা নেই, খেলাছলে তাকে ফেলে দিতে হবে জলে। রামের কাছে সীতা যে খেলবার পুতুল ছাড়া অন্য কিছু ছিল না এই কথাটা বেগম রোকেয়া বলেছিলেন তার একটি লেখাতে। মিথ্যা বলেননি। সাহিত্য সমালোচকরা ওই রকমভাবে দেখেনি ব্যাপারটাকে। কালীদাসের 'শকুন্তলা' নাটকে শকুন্তলাই যে প্রধান চরিত্র, এ বিষয়ে কালীদাসের মনে কোনো প্রশ্ন ছিল না, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে উচ্চ-প্রশংসিত 'একটি বই' 'শকুন্তলাতন্ত্রে' চন্দ্রনাথ বসু দেখাচ্ছেন যে, নাটকের নাম যাই বলুক না কেন, নায়িকা নয়, নায়ক দুঃখই হচ্ছে নাটকের প্রাণকেন্দ্র। ব্যাপারটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উদ্ভূত, এই দৃষ্টিভঙ্গি যতই সুশিক্ষিত হোক— নারীকে প্রধান বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

সন্তানের অপরাধের দায়ভার মাতার ওপর গিয়েই পড়তে চায়। স্বাভাবিক গতিটা ওই দিকেই। বলা হয় চোরের মার বড় গলা। গালি দেবার সময় মাকে টেনে আনাই প্রথা; রসিকতা ভালো জমে না কেহ্নে যদি নারীকে স্থাপন না করা যায়। মাতার বিপরীতে বলা হয়, হ্যাঁ বাপের ব্যাটা। গুণটা বাপেরই, সেখান থেকেই পেয়েছে। আর আছে প্রতারণা। মা দেবী, তার পায়ের তলায় বেহেশত, তাকে রাখি মাথায় করে— এ ধরনের সমস্ত বক্তব্যেই নারীকে তার যোগ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত রাখার সত্যকে লুকাবার অভিপ্রায়টা থাকে। আবার দিয়ে আড়াল করা হয় উপেক্ষা ও অবমাননার বাস্তবতাকে।

নারীর ঐতিহাসিক পরাজয়ের পর তার কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল পুরুষের লালসাকে তৃপ্তিদান ও সন্তান উৎপাদন; বাঙালির সংস্কৃতিতে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঘরকন্মাকে অতিউচ্চ মূল্য দেবার আদর্শিক ষাঁক। এই তৃতীয় কর্তব্যটিকেই বরঞ্চ সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা হয়েছে প্রথম দুটিকে আড়াল করে। আরেকটি লোকগানে গুণধর পুত্রটি যাচ্ছে বিয়ে করতে, যাবার আগে অনুমতি চাইছে তার মায়ের, বলছে, মা, তুমি অনুমতি দাও, তোমার জন্য একটি দাসী নিয়ে আসি। মা খুশি হচ্ছেন। কেননা একদিন তিনি নিজেও ওই ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার শাশুড়ির গৃহে। অন্তঃপুরচারিণী একটি নীরব প্রতিশোধ গ্রহণের রক্তপাতহীন ঘটনা বাঙালির গৃহে গৃহে ঘটেছে, ঘটছে। মাতা প্রতিশোধ নিয়েছেন বধূর ওপর তো বটেই, সন্তান ও স্বামীর ওপরেও, তাদেরকে যথার্থ পুরুষ হতে না দিয়ে। পুরুষ নারীর সেবা নিয়েছে এবং সেবা নিতে গিয়ে ছোট্ট হয়ে গেছে, কাপুরুষে পরিণত হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিলেত রওনা হন তখন সেই খবর তার মায়ের কাছ থেকে যতক্ষণ পারা যায় গোপন রাখা হয়েছিল, মা যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি



সংজ্ঞা হারালেন। এটা অবশ্যই অত্যন্ত গভীর পুত্রসন্তানের প্রকাশ, কিন্তু এ আবার মাতার প্রতিশোধও; তাকে অধিক ও বঞ্চিত রাখার স্বাভাবিক প্রতিশোধ।

হিন্দু সমাজে নারীর অবস্থানের প্রসঙ্গটিই প্রথমে আসে। কেননা তারাই আগেকার, মুসলমান এসেছে পরে এবং মুসলমান সমাজ পূর্বপ্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিজের অজান্তেই গ্রহণ করেছে, অথবা বলা যায়, ওই দৃষ্টি সঙ্গেই ছিল। কেননা মুসলমানদের অধিকাংশ তো ধর্মান্তরিত। প্রাচীনকালে শূদ্রদের যেমন, ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়েদেরও তেমনি পূজার অধিকার ছিল না। এমনকি মধ্যযুগেও বেদ ও স্মৃতি পাঠ মেয়েদের জন্য নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। হিন্দু বিবাহকে বলা হয়েছে 'আধ্যাত্মিক', সে দাবি যে কতটা অসার রবীন্দ্রনাথ তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তার 'হিন্দুবিবাহ' নামের প্রবন্ধটিতে। তার আলোচনায় মনু সংহিতার বিধানবলির কথা উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'মনু সংহিতায় স্ত্রী নিন্দাবাচক যে সকল শ্লোক আছে তাহা উদ্ধৃত করতে লজ্জা ও কষ্টবোধ হয়।' এবং মহাভারতের অনুশাসনপর্বে অষ্টবিংশতক অধ্যায়ে স্ত্রী চরিত্র সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে তা রীতিমতো অশ্লীল— 'বর্তমান সমাজে তাহার সমগ্র ব্যক্ত করিবার যোগ্য নহে।' এবং এও উল্লেখ করেছেন তিনি, মহাভারতের যে কৃষ্ণ আদর্শ ব্যক্তিত্ব তার ছিল ষোড়শ সহস্র মহিষী।

'মনু সংহিতা' বিবাহ-বিচ্ছেদ মানে না, মনে করে বিবাহ চিরস্থায়ী বন্ধন, যেজন্য সহমরণ ও অনুমরণ সমর্থনীয় হয়ে পড়ে। তবে, পুত্রসন্তান লাভ যেহেতু অত্যাবশ্যকীয়, তাই মধ্যযুগের বাংলায় যে স্ত্রী পুত্রসন্তান নেই কিংবা যে বিধবা, পুত্রের আশায় সে যোগ্য পরপুরুষ 'নিয়োগ' করতে পারত। সে যুগে যে স্ত্রীর পুত্রসন্তান নেই কিংবা স্বামী নেই, তাকে মনে করা হতো অপবিত্র। ব্রাহ্মণদের জন্য তাদের হাতে খাদ্যগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। শূদ্রের হাতে ব্রাহ্মণ জল খেত না। তার স্পর্শে জল অপবিত্র হতো, তবে শূদ্র স্ত্রী গ্রহণ করতে তাদের তেমন আপত্তি ছিল না। যার স্পর্শে জল-পবিত্রতা হারাতে নিজের কিন্তু সে পবিত্রই থাকত ব্রাহ্মণদের প্রয়োজনের সময়। স্ত্রীর পক্ষে স্বামীসেবা ছিল মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। বয়ঃসন্ধিতে কন্যার বিবাহ দেওয়া ছিল বাধ্যতামূলক, যে পিতা তাতে ব্যর্থ হতো তাকে শূদ্র বলে গণ্য করা হতো। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কন্যাকে কেন যে বিক্রি করে দিত তা বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই সমস্ত অনুশাসনের কথা জানলে।

'রামায়ণ' তো কেবল মহাকাব্য নয়, ধর্মগ্রন্থ হিসেবেও গ্রাহ্য। সেই রামায়ণে দেখি আমরা সীতাকে বারবার এবং অতি প্রকাশ্যে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। পরীক্ষা রাবণ নিয়েছে, রামও নিয়েছে, নিতেই থাকত যদি না সর্বসহা সীতাও আর সহ্য করতে না পেরে পাতালে চলে যেত। সীতা বনবাসে গেছে, বনবাসে তার কাছে বনবাস মনে হয়নি। কেননা স্বামী সঙ্গে আছে, রয়েছে সে স্বামীগৃহে; বনে গিয়েও তাই সে অলংকার পরে, নুপুর পায়ে চলাফেরা করে লীলাসহকারে। বনের মধ্যেই অনসূয়াকে বলেছে সীতা, 'আর্য্য, পতি যে নারীর গতি তা আমার জানা আছে। আমার স্বামী যদি দুঃশীল ও নির্ধন হতেন তথাপি বিনাদ্বিধায় তার অনুগামী হতাম।' এর বিপরীতে অরণ্য কান্তে রাম বলছে যে, সীতার পরপুরুষ স্পর্শে সে যত দুঃখ পেয়েছে তত দুঃখ রাজ্যনাশে পায়নি, পিতার মৃত্যুতেও নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষণ আহত হয়েছে দেখে রামের শোক প্রকাশের ধরনটি খুবই পুরুষসুলভ। রাম বলছে, 'দেশে দেশে পত্নী পাওয়া যায়, দেশে দেশে বন্ধুও মেলে, কিন্তু এমন দেশ কোথায় আছে যেখানে ভ্রাতা পাওয়া যায়?' এবং অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর সুখের দৃশ্যে রামের যে নিষ্ঠুর উক্তি শুনে শিউরে উঠতে হয় সেটি একজন পুরুষের পক্ষেই করা সম্ভব, কোনো নারীর পক্ষে নয়। রাম বলছে সীতাকে, 'তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ জন্মেছে। নিজের চরিত্র রক্ষা, অপবাদ খণ্ডন এবং আমার বিখ্যাত বংশের গ্লানি দূর করা আমার কর্তব্য।' মনু তার সংহিতায় মেয়েদের ব্যাপারে পুরুষদের নানাভাবে সতর্ক করে দিচ্ছেন। বলছেন, অন্য নারীর সঙ্গে তো নয়ই, নিজের মায়ের সঙ্গেও নির্জন স্থানে যাওয়া যাবে না। কেননা মেয়েদের স্বভাবেই রয়েছে পুরুষকে প্রলুব্ধ করবার প্রবণতা। বোকারা তো বটেই, জ্ঞানীরাও নিরাপদ নয়। পুরুষ কিছুই করে না, সব দোষ মেয়েদের— 'মহাভারতে'ও ওই একই অবিস্বাস। অনুশাসন পর্বে বলা হচ্ছে সেই সুন্দরী রমণীই প্রকৃত প্রতিব্রতা যার মুখ স্বামী ভিন্ন অন্য কেউ দেখতে পায় না। সূর্য নয়, চন্দ্র নয়,

পুরুষালি নামের বৃক্ষও নয়। অসূর্যস্পশ্যার আদর্শ ওখান থেকেই এসেছে। মনু সংহিতাতে নারীকে বলা হচ্ছে কর্ণ ক্ষেত্র, যেখান থেকে পুরুষ তার নিজের জন্য ফসল সংগ্রহ করে থাকে। বিশেষ ফসল হচ্ছে পুত্রসন্তান। ইসলাম ধর্ম নারীকে মর্যাদা দিয়েছে, বিশেষত যে কালে তার প্রবর্তন, সেকালের তুলনায়। তার অনেক নির্দেশ অবশ্যই ওই ঐতিহাসিক সময়ের তুলনায় অগ্রসর। কিন্তু অসুবিধা হয় তখন যখন সব বিধিকেই চিরকালের বিধান বলে মনে করা হয়। আর দ্বিতীয় অসুবিধাটি ঘটে প্রয়োগের ক্ষেত্রে। অর্ধশিক্ষিত ও পুরুষতান্ত্রিক মোল্লারা ওইসব বিধির এমন সব ব্যাখ্যা দেয়, যাতে মেয়েরা অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হয়ে পড়ে।

মেয়ে-পুরুষের সম্পর্কের বিষয়ে কোরআনের একটি উক্তি এই রকম, 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। তোমরা সেখানে ইচ্ছামতো যেতে পার।' (২ : ২২৩) এটাও জানা যে, ইসলামে পুরুষদের জন্য একসঙ্গে চারজন স্ত্রী রাখবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের বেলায় তেমন অধিকারের প্রশ্ন সেখানে অপ্রাসঙ্গিক। সম্পত্তি বন্টনের ব্যাপারে নির্দেশ হচ্ছে এই যে, কন্যাসন্তান পাবে পুত্রসন্তানের অর্ধেক।

(৪ : ১১), ব্যবসা-সংক্রান্ত কোনো চুক্তি তৈরির সময় দুজন পুরুষ সাক্ষীর দরকার হবে, দুজন পুরুষ না পাওয়া গেলে পছন্দমতো একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য নেয়া যেতে পারে। (২ : ৮২) হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, আকিকার সময় ছেলের জন্য দুই ছাগল দিতে হবে, মেয়ের জন্য এক ছাগল। আর এ বিধানও আছে যে, পুরুষ মানুষ মূর্তি উপাসক ও অগ্নিপূজক ভিন্ন অন্য যে কোনো ধর্মমতের মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে, মেয়েরা তা পারবে না।

ধর্মীয় বিধানে যা লেখা আছে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেসবের অনেক রকম অতিরেক ঘটেছে। উপমহাদেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় কাঠমোল্লার সংখ্যা বাংলায় বেশি, যার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাৎপদতা। বাংলা যেমন পিছিয়ে রয়েছে, তার মোল্লারাও তেমনি পিছিয়ে গেছে। এরা ওয়াজ, মিলাদ, ফতোয়া, মাদ্রাসায় পাঠদান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নারীর তথাকথিত অধস্তনতা প্রচার করেছে এবং এখনো সমান বেগে করে চলেছে। ফতোয়াবাজি এখন বরঞ্চ বেড়েছে। এটাও মর্মান্তিক সত্য যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরা আদর্শিকভাবে এসব প্রচারকে মেনে দিতে বাধ্য হয়েছে।

আরবি-ফার্সি শব্দমিশ্রিত ভাষায় লিখিত পুঁথি সাহিত্যে মেয়েদের ওপর আদর্শগত আক্রমণটা অত্যন্ত প্রবল। যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে লেখা মানে মোহাম্মদের 'তানবিহ আল-নিমা' নামক পুঁথিতে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহই বলে দিয়েছেন যে, স্ত্রীলোকের কর্তব্য হচ্ছে খসম ও আল্লাহর সেবা করা। তবে এমন বাজে নারী আছে যারা স্বামী যদি 'দোহরা নেকা করে' তবে কলহ বাধায়। 'জিদ বন্দি ঝগড়া করে মরদর সাত/কেতাবেতে লেখে সেই আওরত বজ্জাত।' ওই সময়েই লেখা, 'নূরুল ইমানের পুঁথিতে' মোহাম্মদ দানেশ ধর্মপথযাত্রীদের আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মৃত্যুর পরে অবশ্যই তারা বেহেশতে যাবে এবং সেখানে তাদের জন্য খাদ্যের কোনো অভাব হবে না। 'গরম পোলাও আর রুটি আর কাবাব/ছোরাই ভরিয়া সবে রাখিবে সরাব।' সরাব মুসলমানদের জন্য হারাম, কিন্তু পরহেজগারদের জন্য তারও সুব্যবস্থা থাকবে। আওরাতও পাওয়া যাবে। 'এয়চাই আওরত সবে দিবেন এলাহি/তাহার মেছেল কেহ দুনিয়াতেও নাই।' আর কি চাইবার থাকতে পারে? তবে সবকিছুই পুরুষের জন্য, মেয়েরা কি পারে তা বলা হচ্ছে না। বোধকরি পুরুষের সেবা করার সুযোগ পাবে, এটাকেও তারা যথেষ্ট পাওনা মনে করবে।

'বেহেশতের মেওয়া', 'মোকসুদুল মোমেন', 'মোকসুদুল মোমেনিন' ধরনের বই গ্রামে ও শহরে নিম্নমধ্যবিত্তের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়, বিশেষ করে বিয়েতে উপহার দেয়ার বেলায় এদের খোঁজ করা হয়। এসব বই নানা রকমের স্থূলতা ও অশ্লীলতায় আকীর্ণ। দৃষ্টিভঙ্গিটি সর্বদাই পুরুষতান্ত্রিক। যেমন ওজুর ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলা হচ্ছে যে, এতে অসামান্য আনন্দ পাওয়া সম্ভব। সে আনন্দের সঙ্গে তুলনীয় হচ্ছে মুখ ও জিহ্বা দিয়ে নারীকে চুম্বনের, অঙ্গুলি দ্বারা মসৃণ ও কোমল নারীদেহ স্পর্শ করার। কোথাও কোথাও আবার বিজ্ঞানমনস্কতার ভান রয়েছে। যেমন- 'নেয়ামুল কোরআনে'। সেখানে বলা হচ্ছে একটা বৈজ্ঞানিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত যে, মেয়েরা ছেলের চাইতে হেয়তর। এর কারণ হচ্ছে ছেলের মস্তিষ্ক মেয়েদের মস্তিষ্কের তুলনায় অধিক ওজনদার। নাকি আরো প্রমাণ পাওয়া গেছে মেয়েদের চাইতে ছেলেরা



বেশি চঞ্চল গতিবান এবং সেজন্যই স্বাভাবিকভাবেই পুরুষ হচ্ছে বহু বিবাহপ্রবণ, আর মেয়েরা এক স্বামী অভিসারী। হাদিস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হচ্ছে, আল্লাহর পরে যদি কেউ এবাদতের দাবিদার হয় তবে সে হচ্ছে স্বামী। বলা হয়েছে, উপযুক্ত কারণ ছাড়া স্বামীর সঙ্গে সহবাসে অসম্মতি, স্বামী ডাকলে সাড়া না দেয়া, নামাজের আগে গোসল না করা, স্বামীর বিনা অনুমতিতে অপরের গৃহে গমন— এ ধরনের অন্যায় করলে স্বামীর অধিকার থাকবে স্ত্রীকে প্রহার করার।

8. বাংলা সাহিত্যে নারীর অধিকারের কথা বহু জায়গায় আছে। নারীর প্রতি অন্যায় আচরণ লক্ষ্য করে ধিক্কারের ধ্বনিও উচ্চারিত হয়েছে। যেমন 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক-নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'-এ (১৮১৯) রামমোহন স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কম এই তত্ত্বের, কেবল অর্ধশিক্ষিতরা নয়, শিক্ষিত লোকেও যে তত্ত্ব বিশ্বাসী তার অসারতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে প্রশ্ন করেছেন, 'স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনো কালে লইয়াছেন যে অন্যায়সে তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন?' মেয়েরা বিশ্বাসঘাতকতা করে— এই অভিযোগের জবাবে রামমোহন লিখছেন, 'দোষ পুরুষের অধিক কি স্ত্রীতে অধিক, চরিত্র দৃষ্ট করিলে বিদিত হইবেক।... আমরা অনুভব করি যে, প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক।' কার অনুরাগ বেশি, স্বামীর নাকি স্ত্রীর, সে প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'দূরে যেতে হবে না 'তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক দুই পুরুষের দুই-তিন শত বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি, আর স্ত্রীলোকের এক পতি।' কৃষ্ণের ছিল লপ্ট লপ্ট, তিনি দেবতা, কিন্তু নরলোকের দেবতাদেরও কম নেই, আছে শত শত। স্ত্রীলোকের ধর্মভয় অল্প— এই দাবির বিপরীতে রামমোহন লিখছেন, 'এত অতি অধর্মের কথা, দেখ কি পর্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা তাহারা কেবল ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে।... বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধঅঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নিচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে রন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোনো অংশ ত্রুটি হয়, তবে তাহাদের স্বামী শাওড়ি দেবর প্রভৃতি কি তিরস্কার না করেন।' খুবই স্পষ্ট বক্তব্য। রামমোহন প্রফুল্লর বাসন মাজা সমর্থন করেন না, তার সংসারধর্ম পালনকে তিনি দাস্যবৃত্তি ভিন্ন অন্যকিছু মনে করেন না, যে আদর্শবাদের বোঝা প্রফুল্লরা বহন করতে বাধ্য হয়, তাকে তিনি ছিন্নভিন্ন করতে চান। এই রচনাতেই তিনি বলছেন যে, সংসারে একজন নারী 'একাধারে রাধুনি শয্যাসঙ্গিনী ও বিশ্বস্ত গৃহরক্ষী বটে।' একজনে তিনজনের কাজ করে। বেতন পায় না।

'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'— (১৮৫৫) বিদ্যাসাগর আবেগদৃষ্ট ভাষায় লিখেছেন, 'তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রী জাতির শরীর পাষাণিসম হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধহয় না, যন্ত্রণা বলিয়া বোধহয় না, দুর্জয় রিপূর্ব এককালে নির্মূল হইয়া যায়।... যে দেশে পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, কেবল লৌকিক রক্ষণই প্রধান ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগ্য অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে।' ওই সময়ে বিধবা মেয়েদেরকে রাড় বলা হতো; শব্দটির অন্য অর্থ হচ্ছে বেশ্যা। প্রভাবতী নামের শিশুটির মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর যে কতটা কাতর হয়েছিলেন তা লেখা আছে তার 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' নামের ছোট রচনাটিতে। বিদ্যাসাগর বলছেন একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে যে প্রভাবতী চলে গেছে, কেননা কে জানে, বেঁচে থাকলে ভাগ্য দোষে তাকে হয়ত 'অসৎ পাত্রের হস্তগত ও অসৎ পরিবারের করাল কবলে পতিত হইয়া অবিচ্ছিন্ন দুঃখসম্মোগে কালাতিপাত করিতে হইত।' সেটা হতো হৃদয়বিদারক।

'বোধহয় তোমার অতর্কিত অন্তর্ধান নিবন্ধন যাতনা অপেক্ষা সে যাতনা বহুসহস্রগুণে গরীয়সী হইত।' প্রভাবতীর পক্ষেও প্রফুল্ল হবার আশঙ্কা ছিল একি, সে আশঙ্কা যদি সত্য হতো তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো উৎফুল্ল হবেন কি, বিদ্যাসাগরের হৃদয় বিদীর্ণ হতো।

বঙ্কিমচন্দ্র যে মেয়েদের দুর্দশার বিষয়ে জানতেন না তা তো নয়। তার নিজের তিন কন্যার একজন আত্মহত্যা করেছিল। তার লেখায় আছে, 'তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যাকে যে পশুর মতো পশ্চালয়ে বন্দি রাখা তাহাতে কি অপমান নাই, কিছু লজ্জা নাই?' ধিক্কার দিচ্ছেন অবশ্যই, কিন্তু স্বরটি জাতীয়তাবাদীর, মেয়েদের প্রতি পাশবিক আচরণ লজ্জার ব্যাপার,

সে কারণে দুঃখে; হৃদয়-বিদীর্ণ হওয়ার ধ্বনিটি শোনা যাচ্ছে না, যেমন শোনা গেল বিদ্যাসাগরের রচনায়। এ ক্ষেত্রে এই দুইজন প্রধান লেখকের মধ্যকার তফাৎটা সামান্য নয়।

বিদ্যাসাগরের 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতবিষয়ক, বিচার, দ্বিতীয় পুস্তকের' (১৮৭৩) সমালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' যে মন্তব্য করেছিলেন, তার মধ্যে একটি জাতীয়তাবাদী উদ্বেগও বর্তমান ছিল। তিনি লিখেছেন, 'আর একটি কথা এই যে, এ দেশে অর্ধেক হিন্দু অর্ধেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্পর্কেই সে আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভালো এমন নহে।' জাতীয়তাবাদী উদ্বেগটা স্পষ্টতই এইখানি যে, হিন্দুর জন্য বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হবে, কিন্তু মুসলমানের জন্য হবে না, ফলে বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। বলা বাহুল্য, এই জাতীয়তাবাদেরই অপর নাম হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা।

নারীর দুঃখ শরৎচন্দ্র যতটা বুঝেছেন, কম বাঙালি লেখকই ততটা অনুভব করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সেই সাধারণ মেয়ে মালতী যে শরৎচন্দ্রের কাছে সানুয় অনুরোধ জানিয়েছিল তাকে তার সাত বছরের প্রবাস-গবী স্বামী নরেশ ও নরেশের বিলেতি মেয়েদের সামনে জিতিয়ে দিতে, সেটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। শরৎচন্দ্র ছাড়া কে বুঝবে মালতীর মর্মবেদনা? 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র লিখেছেন যে, নারীর মূল্য আসলে নির্ভর করে কি পরিমাণে তিনি সেবাপরায়ণা, স্নেহশীলা সতী এবং দুঃখকষ্টে মৌনা। অর্থাৎ তাহাকে লইয়া কি পরিমাণে মানুষের সুখ ও সুবিধা ঘটবে। এবং কি পরিমাণে তিনি রূপসী। অর্থাৎ পুরুষের লালসা ও প্রবৃত্তিকে কতটা পরিমাণে নিবন্ধ ও তুষ্ট রাখিতে পারিবে।' তার এ বক্তব্য এ্যাপেলসের পূর্বোল্লিখিত বিশ্লেষণকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কিন্তু তার সাহিত্যে দেখি আমরা যে প্রফুল্ল হতে অসম্মত মেয়েরা বারবার হেরে যাচ্ছে, ব্যক্তিগত উৎকর্ষের অসম্ভাবের দরুন নয়, সামন্তবাদী আদর্শবাদের কারণে। 'গৃহদাহের' অচলা শহরের মেয়ে, আধুনিক এবং ব্রাহ্মসমাজের সদস্যা। কিন্তু নৈতিকভাবে শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে তার গ্রামের মেয়ে মৃগালের কাছে। মৃগাল 'সনাতন' নারীর আদর্শ যেন; সে রূপগণ, বয়স্ক স্বামীর সেবা করে।' তার মধ্যে কোনো অস্থিরতা নেই, অচলার মধ্যে যা আছে।

পুরুষও অত্যাচারিত, কিন্তু নারী অত্যাচারিত দ্বিতীয়বার। স্বাধীনতার পরে ১৯৭৩-এ, একজন ভারতীয় বাঙালি সাংবাদিক এসেছিলেন বাংলাদেশে। যা দেখেছেন তাতে মোটেই উৎফুল্ল হতে পারেননি। অন্যান্য দৃশ্যের সঙ্গে ছিল একটি দৃশ্যের অনুপস্থিতি, সেইটে হলো মেয়েদের চলমানতা। রাস্তাঘাটে মহিলাদের চোখে পড়েনি। না, রাস্তাঘাটে, মেয়েরা ছিল না, এখনো যে তেমন আছে তা নয়। তারা গেল কোথায়? থাকে কোথায়? আছে ছোট ছোট গৃহে। অনেকে তাও নেই, গৃহ নেই, কেবল ভূমিহীন নয়, গৃহহীনের সংখ্যাও বছরে বছরে বেড়েছে; মাথার ওপর চাল না থাকলে মেয়েরাই ভেজে সর্বাঙ্গে, প্রাকৃতিক বৃষ্টিতে, সামাজিক বৃষ্টিতেও। তারা চুপসে যায়, চোখে যাতে না পড়ে সেটাই চায়। পুরুষ তো চায়ই, মেয়েরা নিজেরাও চায়।

একশ বছর আগে ১৮৯৪তে, রবীন্দ্রনাথ নদীপথে যাচ্ছিলেন, তখন বর্ষাকাল, যেসব দৃশ্য দেখেছেন তা লিখে রেখেছেন চিঠির আকারে। একটি চিঠিতে লিখেছেন তিনি, নদীর ধারে দেখতে পাচ্ছেন, 'গৃহস্থের মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে ঠান্ডা হাওয়ায় বৃষ্টি জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে জল ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্যকর্ম করে যায়— সে দৃশ্য কোনোমতেই ভালো লাগে না।'

হাজার বছর আগের চর্যাপদে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের যে চিত্র পাই তা এ থেকে কতটা খারাপ কিংবা ভালো? চর্যাপদের কালে তবু মেয়েরা কর্মক্ষেত্রে এক ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করত, কৃষকের ঘরে বন্ধ মেয়েরা যেটুকুও পায়নি, তারা সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্যকর্ম করে যায়। রবীন্দ্রনাথের ওই লেখার পর একশ বছর পার হয়ে গেল, এই সময়ে অবস্থার নিশ্চয়ই উন্নতি হয়েছে। হ্যাঁ, কারো কারো হয়েছে, অল্পকিছুর, অধিকাংশের দুর্দশা আগের মতোই, কারো কারো ক্ষেত্রে আবার অবনতি ঘটেছে। কিন্তু ব্যাপারটা খেয়াল করা হয় না। উপর তলার লোকেরা বর্ষায় শোভা দেখে, ভরা নদী দেখে উৎফুল্ল হয়, কিন্তু তাতে অন্য মানুষের যে কী দুর্গতি তার খোঁজ করে না, অন্য মানুষ যেন ভিন্ন গ্রহের প্রাণী। ওই



চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'প্রকৃতি উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা উপদ্রব করে তাও সই, শাস্ত্র চিরদিন ধরে যে সকল উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটা বলতে সাহস হয় না।' সহ্য করে মেয়েরাই বেশি, সাহস তাদেরই কম বাস্তব কারণে। প্রকৃতি অত্যাচার করে, রাজা তো করেই; শাস্ত্রও করে থাকে। শাস্ত্রীয় নিপীড়নটা ব্যাপ্ত এবং গভীর। এটি হচ্ছে আদর্শের নিগ্রহ। এর বন্ধন ছিন্ন করা খুবই কঠিন।

বেগম রোকেয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি আদর্শবাদের বহিরাবরণটিকে কেমনভাবে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সেটি একজন অসাধারণ নারীর কাজ, সাধারণেরা তা পারে না। তাছাড়া এমনকি তাকেও তো সামাজিক অনুশাসন মেনে চলতে হয়েছে। স্কুল করেছেন, লিখেছেন, ভ্রমণ করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন মেয়েদের সম্মেলনে, কিন্তু অবরোধ থেকে বের হয়ে আসতে পারেননি। পর্দা করতে হয়েছে। 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের সঙ্গে তার সাক্ষাতের ঘটনাটি যেমন কৌতুককর তেমনি তৎপর্যপূর্ণ। ১৯২৯-এর ঘটনা। বেগম রোকেয়া 'সওগাতে' লিখেছেন, কিন্তু 'সওগাত' সম্পাদকের সঙ্গে তার কখনও দেখা হয়নি। সম্পাদককে অনুরোধ করেছিলেন তার বাসায় যেতে, বলেছিলেন, খুবই আনন্দের ব্যাপার হতো যদি তিনি নিজে যেতে পারতেন পত্রিকা অফিসে, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। কেননা তিনি অবরোধবাসিনী। নাসিরউদ্দিন গিয়েছিলেন; কিন্তু দেখা হয়নি। রোকেয়া কথা বলেছেন পর্দার ওপার থেকে। টেবিলে নাস্তা সাজানো ছিল। পরিচারিকা এসে বলেছে, মেম সাহেব বলেছেন আপনাকে খেতে, আমি পরে চা নিয়ে আসছি। 'সওগাত' সম্পাদক লিখছেন, 'একটু পরে পর্দার ওপার থেকে হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। হাসতে হাসতে পর্দার ওপার থেকেই বললেন, 'আদাব!... আপনাকে একটা চিঠি দেখাবার জন্য আমি আজ ক'দিন ধরে ব্যস্ত রয়েছি।' বলে তিনি চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। 'আমি চিঠিখানা পড়ছি আর হাসছি। তিনিও পর্দার ভিতর থেকেই হাসছিলেন, শব্দ পাওয়া গেল। চিঠিতে সিলেটের একজন মুসলমান ও চা-বাগানের মালিক তার নিজের পরিচয় ও ধনসম্পদের ফিরিস্তি দিয়ে লিখেছেন যে, 'মহিলা সংখ্যা' সওগাত দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। তার একটি আরজ বেগম রোকেয়ার কাছে, তিনি যেন মধ্যস্ততা করে ওই সংখ্যায় যেসব মহিলার ছবি ছাপা হয়েছে তার মধ্যে ফাতেমা বেগম অথবা ফজিলাতুন নেছার সাথে তার বিবাহের প্রস্তাব দেন। পাত্রীর নামে অনেক সম্পত্তি তিনি লিখে দেবেন; সে বেশ সুখে থাকবে।' ফাতেমা বেগম হচ্ছেন 'সওগাত' সম্পাদকের স্ত্রী; ফজিলাতুন নেছা সেকালের খ্যাতিমান মহিলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণি পেয়েছিলেন। পত্র পাঠ শেষ হলে বেগম রোকেয়া গভীর স্বরে বলেছিলেন, 'যে দেশের একজন প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি অজানা-অচেনা ভদ্রমহিলাকে উদ্দেশ্য করে এ ধরনের চিঠি লিখতে পারেন সে দেশের পুরুষসমাজ কোন স্তরের এবং মেয়েদের প্রতি তাদের ব্যবহার কত অশিষ্ট তা সহজেই ধারণা করা যেতে পারে।'

আসলেই তাই। কিন্তু পুরুষের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবে কোনো গুণগত পরিবর্তন এসেছে কি? না, আসেনি। বৈষম্যমূলক এবং সমাজের যে কোনো পুরুষ তার সম-অবস্থানের যে কোনো মেয়ের চেয়ে নিজেকে বড় মনে করে। অধিকাংশের মনোভূমিতে ফ্যাসিবাদের লালন চলে।

বেগম রোকেয়া মানসিকভাবে মুগ্ধ হয়েও সামাজিকভাবে যে মুগ্ধ হতে পারেননি তার কারণটা লক্ষ্য করা দরকার। মূল কারণ মেয়েদের কর্মে পরাধীনতা এবং কর্মক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা। রোকেয়ার কাজের কোনো বিরাম ছিল না, কিন্তু কর্মে তার স্বাধীনতা ছিল না এবং কর্মক্ষেত্রটিও ছিল সঙ্কীর্ণ। পোশাকশিল্পে যে মেয়েরা আজ কাজ করে, তাদের কর্মক্ষেত্রটি বড় নয়। তারা মজুরি-দাসত্বই করে, তবু একটু যে স্বাধীনতা আছে অর্থাপার্জনের ও চলাফেরার, সেটুকু তারা পছন্দ করে এবং মনের দিক থেকেও তারা বদলে গেছে, প্রফুল্ল যেমন মহা উৎসাহে ঘরে ফিরে গিয়েছিল স্বেচ্ছাবন্দি হবার আকাঙ্ক্ষায় তেমনি করতে তাদের অনেকেই রাজি হবে না, নিতান্ত বাধ্য না হলে পুনরায় আবার তারা কাজের ব্যাধ হতে সম্মত হবে—এমনটা আশা করা যায় না।

রাষ্ট্রনীতিকভাবে অনেক কিছু বদলেছে। ব্রিটিশ গেছে, পাকিস্তানিরা গেছে চলে। কিন্তু এসবই উপর-কাঠামোর ব্যাপার, সমাজে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি, তার কাঠামো আগের মতোই রয়ে গেছে। ছিলাম আমরা পাকিস্তানে, পাকিস্তান নিজেকে একটি ইসলাম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছিল; তখনই বোঝা গিয়েছিল যে, এই রাষ্ট্রে মেয়েরা সমান অধিকার

পাবে না। একাত্তরে ইসলাম রক্ষার নাম করে পাকিস্তানি রাষ্ট্রের বর্বর সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঙালির ওপর; তখন সবচেয়ে কঠিন দুঃসময় গেছে মেয়েদের। অবরুদ্ধ ও আক্রান্ত হয়েছে। সবচেয়ে মর্মান্তিক হচ্ছে এই যে, আক্রমণের চিহ্নগুলো তাদেরকে বহন করতে হয়েছে দেহে ও মনে। লাঞ্ছিতা মেয়েদেরকে সম্মান জানানোর জন্য তাদেরকে যারা 'বীরঙ্গনা' উপাধি দিয়েছিলেন তাদের আন্তরিকতার প্রশংসা করা সম্ভব; কিন্তু দূরদৃষ্টি নয়। কেননা তারা দেখতে পাননি কি ঘটতে যাচ্ছে, বুঝতে পারেননি যে ওই উপাধি একটা দুঃসহ বোঝায় পরিণত হবে, আমেরিকান ঔপন্যাসিক হর্থর্নের উপন্যাস 'দি স্কাল্পেট লেটারের' নায়িকাটির মতো নিজের অপমানের কাহিনি নিজেকেই বিজ্ঞাপিত করতে হবে। তাই বলে যারা উপাধি পায়নি তারা যে বেঁচে গেছে তা নয়, দৈহিকভাবে বাঁচলেও সামাজিকভাবে অসম্মানিত হয়েছে, মর্মে মর্মে দক্ষ হয়েছে নিঃশব্দে। যুদ্ধ পুরুষতন্ত্রকে পরাজিত করতে পারেনি, হানাদার পাকিস্তানিদের পরাজিত করলেও। এসব ক্ষেত্রে আদর্শ হচ্ছে চলমান ট্রেনের ধোয়ার মতো, আগে আগে না, পেছনে পেছনে চলে।

বাংলাদেশ একটি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র, কথা ছিল এই জাতীয়তাবাদ হবে সকল নাগরিকের, এখানে ধর্ম ও শ্রেণি বিভাজন থাকবে না, ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোও সমান অধিকার পাবে, অর্থাৎ রাষ্ট্র হবে গণতান্ত্রিক, যার মূলকথা হচ্ছে অধিকার ও সুযোগের সাম্য। সে ঘটনা ঘটেনি। উল্টো রাষ্ট্রীয় আদর্শগুচ্ছ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা উচ্ছেদ হয়ে গেছে, সেখানে এসেছে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। সমাজতন্ত্র নেই, গণতন্ত্র নামে আছে মাত্র, কাজে অনুপস্থিত। এ রকম একটা বৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় সাধারণভাবে মেয়েদের অবস্থা ছেলেদের চেয়ে খারাপ হবার কথা এবং ঠিক তাই হয়েছে নির্ভুলভাবে।

আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার চরম অবনতি ঘটেছে এবং এর প্রথম ভুক্তভোগী হচ্ছে মেয়েরা। রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে না, বরঞ্চ আগে যেমনটি কখনও ঘটেনি, তেমন ঘটনা ঘটছে, পুলিশও অংশ নিচ্ছে ধর্ষণে। গণধর্ষণের কথা আগে শোনা যায়নি, এখন শোনা যাচ্ছে। কাঠমোলাদের উৎপাত আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষভাবে বিপন্নবোধ করছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেয়েরা। পাকিস্তান আমলেও তারা নিজেদের ততটা অরক্ষিত মনে করেনি, আজ যতটা করছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু নীরবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ ঘটছে, যার একটা বড় কারণ মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব। এখন মেয়েরা পাচার হচ্ছে, বিক্রি হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে ছেলেরা যৌতুকের জন্য বিয়ে করে, সাইকেল, রেডিও, ঘড়ি সব নেয়, তারপর স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে নতুন স্ত্রী গ্রহণ করে। সেই কুলীন ব্রাহ্মণদের মতো।

শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েরা এগিয়েছে, তবে বড় ধীরে ধীরে। উইলিয়াম এ্যাডাম বাংলাদেশ শিক্ষাব্যবস্থার ওপর যে রিপোর্ট লেখেন ১৮৩৫-এ, তাতে দেখা যায় প্রদেশের কোথাও মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় নেই। শিক্ষাকে তখন কেবল অপ্রয়োজনীয় নয়, অন্যায্যও মনে করা হতো। ১৯০৬-এর একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ—বিদ্যালয়ে যাবার উপযুক্ত মেয়েদের শতকরা মাত্র ২.৭ জন সেখানে যেতে পারছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাজ শুরু করে ১৯২১ সালে, ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮৮৭ জন, ছাত্রী সংখ্যা ১। ১৯৪৬-৪৭-এ এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১০০; ১৯৪৭-৪৮-এ নেমে যায় ৭২-এ। ১৯৩৩-এর আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো সার্বক্ষণিক শিক্ষিকা ছিলেন না। বার্ষিক সম্মাবর্তনে ১৯২৬ পর্যন্ত কোনো মহিলা উপস্থিত হননি। এখন সব স্তরেই ছাত্রী সংখ্যা বেড়েছে, মেয়েরা ভালো করছে, কিন্তু তাদের কর্মক্ষেত্র এখনও সঙ্কীর্ণ, চলাফেরা বিপদসঙ্কুল।

সব মিলিয়ে সত্য এই যে, সমাজ মনুষ্য বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। একে মানবিক করতে হলে বৈষম্য দূর করা চাই, যেমন ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য তেমনি পুরুষ-নারীর বৈষম্য। সে কাজ করবার সময় নারীত্বের আদর্শ সম্পর্কে অনুশাসনের উৎপীড়নকে যেন না ভুলি। এই আদর্শবাদের তৎপরতা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এরই উৎপীড়নে এককালে সতীদাহে দক্ষ বিধবাদের কেউ কেউ মনে করতে বাধ্য হতো যে, তারা আগুনে পুড়েছে না, বরঞ্চ স্বর্গে আরোহণ করছে। ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ সবাই মেয়েদের বিপক্ষে কাজ করেছে, এই বিরূপতায় পরিবর্তন আনতে ব্যাপক ও মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে। সমাজ কাঠামোতে যেমন, তেমনি আদর্শিক ধ্যান-ধারণায়। আগে পরে নয়, এক সঙ্গেই। ৪৩